ফরিদপুরের উপভাষার শব্দার্থতত্ত্ব

ইয়াসমীন আরা লেখা

উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

সারসংক্ষেপ

ভাষাবিজ্ঞানের বিবেচনায় ভাষার ক্ষুদ্রতম একক বাগ্‌ধ্বনি হলেও কার্যকর একক হচ্ছে শব্দ বা রূপমূল। ভাষায় ধ্বনির কার্যকর ব্যবহার তখনই ঘটে, যখন এক বা একাধিক ধ্বনিসহযোগে গঠিত ভাষিক এককে কোনো অর্থসংশ্লিষ্টতা সৃষ্টি হয়। এ ভাষিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হলো শব্দের 'অর্থ'—যা রূপমূল, শব্দাংশ এবং বাক্যের প্রাণ। ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থের বিভিন্ন মাত্রিকতা, স্তর এবং ব্যবহারিক বিষয়ে যে-বৈচিত্র্য রয়েছে তা 'শব্দার্থতত্ত্ব' বা 'বাগর্থতত্ত্বে' আলোচনা করা হয়। উপভাষার রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শব্দার্থতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ফরিদপুর অঞ্চলের উপভাষার শব্দার্থতত্ত্ব এ নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: শব্দার্থতত্ত্ব, অর্থবিচার, বিপরীতার্থক রূপমূল, ধ্বন্যাত্মক রূপমূল, ভাষা ব্যবহারে আপেক্ষিক ভিন্নতা

ভূমিকা

ফরিদপুর বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক জেলা। বাংলাদেশের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত এই জেলা নয়টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের উপভাষাগুলোর শ্রেণিকরণে ফরিদপুরের উপভাষা 'পূর্ববঙ্গীয়' শাখার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে ভাষাতাত্ত্বিকগণ 'বঙ্গালি' শাখাকে দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা: (ক) বিশুদ্ধ বঙ্গালি (ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোর) এবং (খ) চট্টগ্রামী (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী)। বর্তমানে এ দুটি শাখার উপভাষাগুলো স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীকালের শ্রেণিকরণে পূববঙ্গীয় শাখার দ্বিতীয় উপশাখায় ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার উপভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যশোর ও খুলনার উপভাষার সঙ্গে ঔপভাষিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও ফরিদপুরের উপভাষার বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। শব্দার্থতত্ত্বের আলোকে এ উপভাষার স্বাতন্ত্র্য আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভাষার প্রকাশরূপের তিনটি দিক—ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য সমন্বয়ে ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। ভাষার আরও একটি গভীরতর দিক আছে, সেটা হলো তার অর্থের দিক (Content or meaning aspect)। এই অর্থের তত্ত্ব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভাগটি গড়ে উঠেছে তা হলো শব্দার্থতত্ত্ব (শ', ১৪০৩)। শব্দের মূল রূপ নিহিত আছে তার অর্থে; ভাষার পরিবর্তন শুধু ধ্বনি এবং শব্দ ও ধাতু রূপে পরিবর্তন আনে না,

শব্দের অর্থেও ঘটায় পরিবর্তন। ভাষাতত্ত্বের যে শাখায় এই অর্থ পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হয় তাকে বলে শব্দার্থতত্ত্ব (কাদির, ১৯৭৫)। শব্দের অর্থ বিচার শব্দার্থ বিজ্ঞানের অন্তর্গত (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৮)। বলা যায়, শব্দার্থ হলো ভাষার প্রাণ; এই ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। কিন্তু 'শব্দের অর্থ পরিবর্তন অনেকটাই মানব মনের খেয়াল খুশির উপরে নির্ভর করে, তাকে ধ্বনি পরিবর্তনের মতো বৈজ্ঞানিক সূত্রে বাধা যায় না।' এই কারণে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে কেউ কেউ শব্দার্থতত্ত্বকে (Semantics) ঠিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করতে চান না, তাকে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের এলাকায় সরিয়ে দিতে চান। এই কারণেই হয়ত ভারতে এ শাখাটি একদিন ন্যায়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পাশ্চাত্যে অনেকে একে পরাবিদ্যার (Metaphysics) অন্তর্গত করেছিলেন (শ', ১৪০৩)। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারা মোটামুটি তিন রকমের (ক) অর্থ বিস্তার বা প্রসার (খ) অর্থ সংকোচ (গ) অর্থ সংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ (সেন, ১৯৯৫)। শব্দার্থের এই ত্রিবিধ ব্যঞ্জনার আলোকে ফরিদপুরের উপভাষার বিশিষ্টতা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। প্রধানত মুখ্য উৎসভিত্তিক (primary source) তথ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গ্রন্থ গৌণ উৎস (secondary source) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফরিদপুরে বসবাসকারী বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠী এ গবেষণার সমগ্রক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানলব্ধ ধারণা থেকে অঞ্চলভিত্তিক যে ঔপভাষিক ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে তা উপভাষী ও উপভাষা অঞ্চল নির্বাচনে সহায়ক হয়েছে। এ জেলায় বসবাসকারীদের মধ্যে উপভাষা সংগ্রহ এবং ঔপভাষিক ভিন্নতার ধারণা লাভের লক্ষ্যে শিক্ষা, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক স্তর-ভেদে বিভিন্ন বয়সী উপভাষীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পারিবারিক-সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবেশে ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণমূলক উপাত্ত (empirical data) সংগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত দলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. রূপমূলের অর্থের ভূমিকা

রূপতত্ত্বের দিক থেকে অর্থ বিচারে লক্ষ করা যায় যে, বিভিন্ন পর্যায়ে রূপমূলের অর্থের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। তাছাড়া অর্থগত বিমূর্ততাও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় (মোরশেদ, ১৯৯৪)। যথা—

(১) ক. ধলুর চুল পাকছে (ধলুর চুল পেকেছে)। এখানে 'পাকা' রূপমূলের অর্থ দাঁড়ায়—বার্ধক্যের লক্ষণ।

খ. তার সগোল কাজে পায়ামী এয়েবারে শোইজ্জো অয় না (তার সকল কাজে পাকামি একেবারে সহ্য হয় না)। 'পাকা' এখানে ইঁচড়ে পাকা বা মাতব্বরি রূপে ব্যবহৃত।

গ. মানুষডা হিসেবে পায়া (লোকটা হিসাবে পাকা)। 'পাকা' দক্ষতা বা পারদর্শিতারূপে এখানে ব্যবহৃত।

ঘ. বোউডা পায়া রান্দুনি (বধূটা পাকা রাঁধুনি)। এখানে 'পাকা' দক্ষ, নিপুণ, ভালো অর্থে ব্যবহৃত।

উপরের উদাহরণসমূহে রূপমূলের বিভিন্ন অর্থগত দিকের পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ ক্ষেত্রে অর্থতত্ত্ববিদগণ রূপমূলের দু-ধরনের অর্থের উল্লেখ করেছেন।

১. রূপমূলের আভিধানিক অর্থ।

২. রূপমূলের পরিবেশগত অর্থ।

আভিধানিক অর্থ রূপমূলের প্রধান অর্থ নির্দেশ করে। আর বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহৃত সমশ্রেণির রূপমূলের অর্থ পরিবেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। রূপমূলের আভিধানিক অর্থ মোটামুটিভাবে সুনির্দিষ্ট, এক্ষেত্রে অর্থবোধকতায় অসুবিধা সৃষ্টি না হলেও পরিবেশগত অর্থ নিরূপণে অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যথা—

(২) ক. রফিক মাচ দরছে (রফিক মাছ ধরেছে)।

খ. শফিক মাডে গ্যাছে (শফিক মাঠে গিয়েছে)।

গ. ধলু হাবিবরে ভাত দিছে (ধলু হাবিবকে ভাত দিয়েছে)।

ওপরের বাক্য তিনটিরই বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এবং জটিলতাও সৃষ্টি হতে পারে। বাক্যগুলো এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যথা— ২ (ক) সংখ্যক বাক্যে—

(৩) ক. রফিক আর হাবিব অ্যাক গিরামে থায়ে। হাবিব আমারে কোইলো যে, রফিক মাচ ধরতি গ্যাছে।

(রফিক ও হাবিব এক গ্রামে থাকে। হাবিব আমাকে বলল যে রফিক মাছ ধরতে গিয়েছে)।

খ. আমি রফিকরে মাচ ধরতি যাতি দেকছি। (আমি রফিককে মাছ ধরতে যেতে দেখেছি)।

গ. রফিক আর আমি এক বিলি মাচ ধরি, তারে আমি বিলি মাচ ধরতি দেইখে আইলাম।

(রফিক আর আমি এক বিলে মাছ ধরি, তাকে আমি বিলে মাছ ধরতে দেখে এলাম)।

ঘ. রফিক বাড়িতি কইয়ে গ্যাছে যে, হে মাচ ধরতি গ্যাছে।

(রফিক বাড়িতে বলে গেছে যে, সে মাছ ধরতে গিয়েছে)।

এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্রের সাহায্যে রফিকের মাছ ধরার সংবাদ জানা সম্ভব। এভাবে অর্থ করার ফলে বিভ্রান্তিও দেখা যেতে পারে। যেমন: ৩ঘ নং বাক্যে রফিক বাড়িতে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা বলে গিয়েছে। কিন্তু সে পথিমধ্যে মাছ ধরতে না গিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে। ফলে সিদ্ধান্ত নিরূপণের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে।

২ (খ) নং বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। যথা—

(৪) ক. শফিক মাডে গ্যাছে (শফিক মাঠে গিয়েছে)।

খ. শফিক মাডে ধান কাটতি গ্যাছে (শফিক মাঠে ধান কাটতে গিয়েছে)।

গ. শফিক মাডে গরু বানতি গ্যাছে (শফিক মাঠে গরু বাঁধতে গিয়েছে)।

আবার ২ (গ) সংখ্যক উদাহারণের ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে। যথা—

(৫) ক. ধলু হাবিবকে ভাত খাতি দিছে (ধলু হাবিবকে ভাত খেতে দেছে)।

খ. হাবিব খাতি নেছোলো/নিছিলো, সেই ভাত ধলুকে ফেরোৎ দিছে। (হাবিব খেতে নিয়েছিল সেই ভাত ধলুকে ফেরৎ দিয়েছে)।

গ. ধলু কাজে যাওয়ার জন্যি হাবিবকে ভাত খাতি দিছে। (ধলু কাজে যাওয়ার জন্য হাবিবকে ভাত খেতে দিয়েছে)।

এছাড়াও রূপমূলের স্বতন্ত্র প্রয়োগে অর্থতত্ত্বে রূপমূলের অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশে সম্ভাবনা অনেক সময় থাকতে পারে। নিম্নের উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে—

(৬) ক. আমাগে ঘরে লোকখি আইছিলেন (আমাদের ঘরে লক্ষ্মী এসেছিলেন)।

খ. ঐহেনে কুমলা (ওখানে কমলা)।

'লক্ষ্মী' এখানে একজন (নারী) ব্যক্তির নাম। আবার 'লক্ষ্মী' ধনের দেবী। দুই অর্থেই 'লক্ষ্মী' ব্যাখ্যা করা যায়। এবং 'কুমলা' এখানে একটি মেয়ের নাম। আবার কুমলা একটি ফল হতে পারে। কমলাও দুই অর্থে ব্যাখা করা যায়।

উপরের উদাহরণসমূহে রূপমূলের যেভাবে অর্থগত দিক প্রকাশিত হয়, তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবারে রূপমূলের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিগত নাম এবং চিহ্ন ও প্রতীক সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

রূপমূল যখন কোনো শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে সেক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে তার অর্থ প্রকাশিত হয়। যথা—'টেবিল' অর্থে প্রতিটি টেবিল, যার অস্তিত্ব ছিল এবং থাকবে তা নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আনুভূতিক অভিজ্ঞতার দিকটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আবার রূপমূলের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য দুটো পর্যায়ে বিভক্ত। যে শ্রেণিভুক্ত নামের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে এবং তা ব্যবহারকারীদের মনে যেভাবে সেই বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আনুভূতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে শ্রেণিগত নাম অর্থে রূপমূলের প্রকৃত বা উপযুক্ত অর্থগত দিক এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অর্থে রূপমূলে আনুভূতিক অর্থগত দিক নির্দেশিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, রূপমূলের স্পষ্ট অর্থ ছাড়াও আরোপিত অর্থ প্রকাশিত (মোরশেদ, ১৯৯৭)।

রূপমূলের বিভিন্নধারিক অর্থ প্রকাশে ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে প্রকাশিত অর্থগত দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রূপমূল যদি নামবাচক বিশেষ্য হয় সেক্ষেত্রে শ্রেণিগত অর্থ লক্ষ করা যায়। কারণ নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয়ে থাকে।

নামবাচক বিশেষ্যমূলক রূপমূল ছাড়া অন্যান্য রূপমূল ব্যবহৃত হয়, যা কোনো প্রসঙ্গ নির্দেশ করে না। যথা: মোন্দো (মন্দ), সোন্দর (সুন্দর), ব্যথা (ব্যথা) ইত্যাদি রূপমূল অভ্যন্তরীণ আনুভূতিক পর্যায় প্রকাশ করে। অবিচার, অসত্য ইত্যাদি রূপমূল ব্যক্তিবিশেষের মানসিক গঠন ও অন্যান্য দিক নির্দেশ করে।

২. রূপমূলের অর্থের ভিন্নতা

রূপমূলের সাধারণত দুটো অর্থ যখন ক্রিয়াশীল থাকে তখন তা দ্ব্যর্থক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বাক্যে ব্যবহৃত কোনো রূপমূলে এ ধরনের অনেক দ্ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। যথা—

(৭) ক. মানুষডা তার কাজের হিসেব করতিছে। (লোকটা তার কাজের হিসেব করছে)

খ. হে তার কথা ভাবতিছে। (সে তার কথা ভাবছে)

ওপরের বাক্যদ্বয়ের একাধিক তাৎপর্য রয়েছে। (৭)-ক বাক্যে লোকটি তার নিজের কাজের হিসেব করছে, কী কী কাজ সে করেছে বা কী কী কাজ তার আছে বা করতে হবে তার হিসেবে করছে। আবার একজন লোক কাজ করছে, অন্য একজন লোক তার কাজের হিসেব করছে। (৭)-খ নং বাক্যে একজন লোক নিজে তার কথা ভাবছে তার ভাবনা হতে পারে নানাবিধ। তার নিজের জীবন, পূর্বে তার অবস্থা কী ছিল এখন কী হবে। একটা কাজে সে হাত দিয়েছে এ কাজে তার নিজের কী লাভ হবে—নানাবিধ ভাবনা সে ভাবছে। আবার অন্য অর্থ হতে পারে। যেমন—একটা লোক অন্য কোনো লোকের কথা ভাবছে। হতে পারে অন্যের দুঃখের কথা ভাবছে। বা অন্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে বসে বসে তার কথা ভাবছে। আবার অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তার উপকার সে কীভাবে করতে পারে তা ভাবছে।

দেখা যাচ্ছে, ওপরের উভয় উদাহরণে একাধিক অর্থ রয়েছে। আবার বাক্যে ব্যবহৃত কোনো বিশেষ রূপমূলের একাধিক অর্থ থাকলেও সমগ্র বাক্যের অর্থ দ্ব্যর্থক হতে পারে।

বাক্যের দ্ব্যর্থকতা দূরীকরণে সংযোগস্থলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপমূল গঠনে সংযোগস্থল ধ্বনিগত উপলব্ধি প্রধান এবং সংযোগস্থল সংযুক্ত রূপমূল বাক্যে ব্যবহারের পর অর্থগত দিক অনুধাবন সহজসাধ্য হয় (মোরশেদ, ১৯৯৭)। যথা—

(৮) কান-না = কান-না

কান+না = কান্না

উপরের উদাহরণে দুটো রূপমূল রয়েছে এবং রূপমূলে দুটোকে আপাতদৃষ্টিতে দ্ব্যর্থক মনে হতে পারে। কেননা রূপমূল দুটো সমশ্রেণির ধ্বনি দ্বারা গঠিত এবং দুটো অর্থ আছে। কিন্তু লক্ষ করলে বোঝা যায়—কান্না-র ক্ষেত্রে শেষের স্বর 'আ'-তে স্বরাঘাত কম পড়ে, এবং অন্যদিকে 'কান না'-এ অর্থবাচক রূপমূলের শেষে 'আ' স্বরের ওপর অধিকতর স্বরাঘাতের উপস্থিতি। অন্যদিকে একটি রূপমূলে সংযোগস্থল রয়েছে ও অপরটিতে সংযোগস্থল নেই। এ থেকেও দুটো রূপমূলের পৃথক অর্থ অনুধাবন করা যায়।

রূপমূলের দ্ব্যর্থকতার পাশাপাশি অর্থের অস্পষ্টতা সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাক্যে রূপমূল যখন নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশ করে না তখন অস্পষ্টতা লক্ষ করা যায়। যথা—

(ক) পিরায় সারা রাত (প্রায় সারারাত্রি)।

(খ) সুময়ডা (সময়টা)

অর্থাৎ সারা রাত (সারারাত্রি) বা সুময়ডা (সময়টা) রূপমূল কী অর্থ প্রকাশ করছে তা স্পষ্ট নয়।

অর্থগত অস্পষ্টতার অধিকতর নির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান, অনেক সময় প্রসঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট পৃথকীকরণ সীমারেখার অভাবে এই শ্রেণির দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হতে পারে (মোরশেদ, ১৯৯৭)।

৩. ভাষা ব্যবহারে আপেক্ষিক ভিন্নতা

সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের ধারা অনুযায়ী বাক্যরীতিকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। যথা—

(ক) তথ্যপূর্ণ বা ধারণক্ষম
(খ) প্রশ্নাত্মক
(গ) নির্দেশক
(ঘ) অভিব্যক্তিপূর্ণ
(ঙ) স্মৃতিমূলক (মোরশেদ, ১৯৯৭)।

বাক্রীতির এ পাঁচটি পর্যায়ে ধরে ফরিদপুরের উপভাষার রূপমূলের উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

ক. তথ্যপূর্ণ বা ধারণক্ষম:

এখানে বর্ণিত তথ্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া হলো। যথা—

তার মন খুব খারাপ যাতিছে (তার মন খুব খারাপ যাচ্ছে)।
ওর কিরোম জানি লাগদিছে (ওর কেমন যেন লাগছে)।

খ. প্রশ্নাত্মক:

এখানে তথ্য বর্জনই হচ্ছে প্রাথমিক উদ্দেশ্য, যথা—

সে বাড়িতি আছে? (সে বাড়ি আছে?)
কী করেন? (কী করেন?)
অ্যাহোন দ্যাহা করা যাবেনে? (এখন দেখা করা যাবে?)

গ. নির্দেশক:

এখানে অন্য একজনের আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানই প্রধান উদ্দেশ্য। যথা—খারা (দাঁড়া), থাম (দাঁড়া), কাম বন্দো রাইহো (কাজ বন্ধ রাখো) ইত্যাদি।

ঘ. অভিব্যক্তিপূর্ণ:

একজনের অনুভূতি বা অনুভব চেতনা সম্পর্কে প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং অন্যকে জ্ঞাত করা হয়নি এই মনোভাব প্রকাশিত। যেমন—'খারাপ লাগতিছে' এর পরিবর্তে আন্তরিক পরিতৃপ্তির জন্যে বাহ্যিক প্রকাশ। এক্ষেত্রে কোনো শ্রোতা ছাড়াও তা সাধিত হতে পারে। যেমন: উহ! কী গরম। কী জোচনা (জোছনা)।

ঙ. স্মৃতিমূলক:

এক বা একাধিক মনে বিশেষ আনুভূতিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে বক্তার নিজের আনুভূতিক দিকের প্রকাশ। যথা—

সে আমাগের বাড়িতি ম্যালা দিন আছিলো।
(সে আমাদের বাড়ি অনেক দিন ছিল)
অ্যাক দিন এইহেনে খারাইয়ে আমাগের সাতে কথা কোইছিলো।
(একদিন এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল)

৪. অর্থবিচার

রূপমূলের অর্থবিচারের বিষয়টি বর্ণনাত্মক বাগর্থতত্ত্বের অন্তর্গত। সে অনুযায়ী এ উপভাষার বর্ণনাত্মক কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে।

৪.১ ধ্বনিতত্ত্বীয় সদৃশ:

রূপমূল গঠনে রূপমূলের ঐক্য ও মাত্রা নির্দেশে ধ্বনিতত্ত্বের ভূমিকা বিদ্যমান। তাছাড়া বিভিন্ন রূপমূল গঠনের ফলে যে অর্থের পার্থক্য সূচিত হয়—তার ব্যাখ্যা ধ্বনিতত্ত্বের দ্বারাই সম্ভবপর। রূপমূল গঠনে ধ্বনিগত দিকের উপলব্ধি তিনভাবে সম্ভব: মূলধ্বনি বিশেষ পারম্পর্যের ক্রমবিন্যাসের মধ্য দিয়ে রূপমূলের অবয়ব গঠন করে, রূপমূলের অক্ষর গঠন নির্দেশ করে; এবং মূলধ্বনি দ্বারা গঠিত রূপমূল হচ্ছে অবিভাজ্য ও অবিচ্ছিন্ন। রূপমূল গঠনে ধ্বনির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রভাব বিদ্যমান। যে-কোনো ভাষায় আদি মধ্য ও অন্ত্য রূপমূল সংযুক্তি ধ্বনির সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়। ভাষার রূপমূলের প্রথমে কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি, মহাপ্রাণতার দিকও সমভাবে উল্লেখযোগ্য, এছাড়া রূপধ্বনি প্রকরণে স্বরভক্তি, অপিনিহিতি প্রভৃতি ধ্বনিগত সূত্র রূপমূল গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে (মোরশেদ, ১৯৯৭)।

৪.২ আভিধানিক রূপতত্ত্ব:

রূপমূলের বিভিন্ন সমস্যা আভিধানিক রূপমূলতত্ত্বে আলোচিত হয়। অনুপূরকতার ক্ষেত্রে রূপমূলের একতা লক্ষ করা যায়। যেমন—আওয়া (আসা), এল, যাওয়া (গেল)। এর সঙ্গে রূপমূলের গঠনগত দিক সম্পর্কেও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়াও লক্ষণীয়। যেমন: ল্যাম (Lamp) অর্থগত দিক সব আলোই ল্যাম নয়। রূপমূলীয় দিক (বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে অসুবিধে) বাংলায় এর অর্থ সব রকমের আলো নয়, একটি বিশেষ রকমের আলো, যা পিতল বা মাটির তৈরী পাত্র এবং যা তেল ও সলতে সংযোগে আলো দান করে।

৪.৩ অর্থগত সদৃশ:

অর্থের স্বাধীনতা রূপমূলের অতিরিক্ত প্রকাশভঙ্গী গঠনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। অর্থের পরিবর্তনের ফলে ভাষাগত পরিবেশও পরিবর্তিত হয়। ফলে তা বিভিন্নভাবে চিহ্নিত হতে পারে। যথা—

ক. আনুভূতিক মূল্য:

কোনো কোনো সময় কোনো কোনো রূপমূলের অর্থ নির্ধারণে অনুভূতির প্রাধান্য

পরিলক্ষিত হয়। যদিও ফরিদপুরের উপভাষা-অঞ্চলে নিরক্ষর জনগণের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার নেই বললেই চলে। তবুও দোভাষী পুঁথি, যথা—*জঙ্গনামা*, *গাজী কালুর পুঁথি* অথবা যাত্রার শ্রোতা হিসেবে তাদের অনুভূতিকে নাড়া দেওয়ার মতো রূপমূলের মুখোমুখি হয়। তাছাড়া কথোপকথনে তারা এ ধরনের রূপমূল ব্যবহার করে। যথা—মায়া, মায়াবী, দরদ, আদর, যত্ন, পিরিত (প্রীতি) ইত্যাদি।

উল্লিখিত রূপমূলগুলো পরিবেশ অনুযায়ী একই রূপমূল কখনো কম ও কখনো বেশি অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু 'গরু' কোনো অনুভূতি ছাড়াই ব্যবহৃত হয়।

খ. অর্থগত ক্রমবিন্যাস:

ক্রিয়ামূলক রূপমূলের অর্থ বিভিন্ন হতে পারে। বিশেষণের ক্ষেত্রে অর্থ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—কালি। এখানে কালি অর্থে কালো রং বুঝায়। কিন্তু বিস্তৃতভাবে যে কোনো রঙের কালিকেই কালি বলা হয়।

গ. প্রয়োগের পরিবর্তন:

অভিধানে যেমন রূপমূলের অর্থের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায়, আঞ্চলিক রূপমূলের ক্ষেত্রে অর্থের বিভিন্নধারিক প্রয়োগ হতে পারে।

ঘ. সমোচ্চরিত ভিন্নার্থক রূপমূল:

সমধ্বন্যাত্মক রূপমূল ফরিদপুরের উপভাষায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে সেসব রূপমূলের অর্থ ভিন্ন হয়ে থাকে এবং নাম ও অনুভূতির মধ্যে অর্থ একটি পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। একটা নাম ও একটা অনুভূতি যে পরিবেশগত দিকের সূচনা করে, তার প্রকার অনুসারে দুভাগে দেখানো যায়। যেমন—

(১০) ক. বিভিন্ন নামের সঙ্গে একটা অনুভূতি: ভিন্নার্থক রূপমূল

খ. একটা নামের সঙ্গে বিভিন্ন অনুভূতি: প্রয়োগের পরিবর্তন, সমধ্বন্যাত্মক রূপমূল ও বিভিন্ন অর্থ। —এখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

৪.৩.১ বিভিন্ন নামের সঙ্গে একক অনুভূতি: ভিন্নার্থক রূপমূল

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ আছে যেগুলো বাক্যে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এগুলোকে ভিন্নার্থক শব্দ বলে।

(১১) ক. মুক (মুখ)

অঙ্গ, অপমান, আশীর্বাদ, খাতির, গাইল (গালি), দিক, ভাষা, লজ্জা, সামাল (সংযত) সুনাম।

(১২) ক. হাচনের মুহি (অঙ্গ) ঘা অইছে।
(হাচনের মুখে ঘা হয়েছে)
খ. খবিশডা বংসির মুক (অপমান) রাখেনেই।
(খবিশটা বংশের মুখ রাখে নি)
গ. তোর মুহি (আশীর্বাদ) ফুল চন্দন পোরুক।
(তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক)

ঘ. একমাত্র তোর মুখ দেইহে (খাতির) তারে যাতি দিলাম।
(একমাত্র তোমার মুখ দেখেই তাকে যেতে দিলাম)
ঙ. মাইয়েডা মুক (গালি) খারাপ করিছে।
(মেয়েটা মুখ খারাপ করেছে)
চ. পশ্চিম মুহে (দিক) ছেজদা দ্যাওয়া লাগে।
(পশ্চিম দিকে সিজদা দিতে হয়)
ছ. মুহে (কথায়) মদু অন্তরে বিশ।
(মুখে মধু অন্তরে বিষ)
জ. সে আর মুক দিহাইতি (লজ্জা) পারবি না।
(সে আর মুখ দেখাতে পারবে না)
ঝ. মুক সামলাইয়ে (সংযত) কথা কোইশ।
(মুখ সামলিয়ে কথা বলিস)
ঞ. পুলাডা বায়ের মুক (সুনাম) রক্ষা করিছে।
(ছেলেটা বাপের মুখ রক্ষা করেছে)

ফরিদপুরের উপভাষায় এ ধরনের ভিন্নার্থক রূপমূল প্রচুর ব্যবহৃত হয়। যথা—১। আত (হাত), ২। কতা (কথা), ৩। চোক (চোখ), ৪। পায়া/পাহা (পাকা), ৫। মাতা (মাথা), এবং ৬। কাঁচা ইত্যাদি। অবশ্যই এ রূপমূলগুলো চলিত বাংলাতে ব্যবহৃত হয়। তবে বাক্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফরিদপুরের উপভাষায় ভিন্ন উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে আরও কয়েকটি ভিন্নার্থক রূপমূলের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো।

(১৩) হাত

অঙ্গ, অধিকার, অভাব, আরম্ভ করা, ক্ষমতা, খ্যাতি, ঘনিষ্ঠ, চুরির অভ্যাস। চোঁখের সামনে, দক্ষতা, দ্রুত, পকেট খরচ, বশ করা, সাক্ষাৎ।

(১৪) ক. অঙ্গ: ফকিরডার অ্যাক হাত কাডা।
(ভিক্ষুকটির একটি হাত কাটা)
খ. অধিকার: এ কাজে আমার কুনো আত নেই।
(এ কাজে আমার কোনো হাত নেই)
গ. অভাব: তার খুব আত টানাটানি চইলছে।
(তার খুব হাত টানাটানির চলছে)
ঘ. আরম্ভ করা অর্থে: কাজডায় অ্যাহোনও আত দেইনেই।
(কাজটিতে এখনও হাত দেই নি)
ঙ. ক্ষমতা: লোকডারে অ্যাক আত দ্যাহাইয়ে ছারবো।
(লোকটাকে এক হাত দেখিয়ে ছাড়ব)
চ. খ্যাতি: সগোল ডাকথারের আত যশ সুমান অয় না।
(সব ডাক্তারের হাত যশ সমান হয় না)

ছ. ঘনিষ্ঠ: সে আমার আতের মানুষ।
(সে আমার হাতের মানুষ)

জ. চুরির অভ্যাস: তার আত টানের অভ্যেস আছে।
(তার হাত টানের অভ্যাস আছে)

ঝ. চোখের সামনে: চুরি করতি যাইয়ে সে আতে-নাতে ধরা পইড়ছে।
(চুরি করতে গিয়ে সে হাতে হাতে ধরা পড়েছে)

ঞ. দক্ষতা: সেলিম কাজ কোইরে কোইরে আত পাহাইছে।
(সেলিম কাজ করে করে হাত পাকিয়েছে)

ট. দ্রুত: আত চালা নইলি কাজ শ্যাশ অবেনানে।
(হাত চালা নইলে কাজ শেষ হবে না)

ঠ. পকেট খরচ: আমার বাহে আমারে অ্যাক পয়সাও আত খরচা দ্যায় না।
(আমার বাবা আমাকে এক পয়সাও হাত খরচা দেয় না)

ড. বশ করা: রফিকরে আত করলি লাবু কাবু অবেনে।
(রফিককে হাত করলে লাবু কাবু হবে)

ঢ. সাক্ষাৎ: লোকডারে আতে পাইলি হয়।
(লোকটাকে হাতে পেলে হয়)

(১৫) মাতা (মাথা)
অধীনতা স্বীকার, আদর, কসম, ক্রোধ, চুল, পরিশ্রম, প্রত্যঙ্গ, প্রধান, বুদ্ধি, শীর্ষে, সর্বনাশ এবং হতাশ।

(১৬) ক. অধীনতা: তার কাছে ও মাতা নত করবে না।
(তার কাছে ও মাথা নত করবে না)

খ. আদর: অর বাহে অরে মাতায় তোলছে।
(ওর বাপে ওকে মাথায় তুলেছে)

গ. কসম: আমার মাতা খা তুই ওরম কাজ কোরিশ নে।
(আমার মাথা খা তুই ওরকম কাজ করিস না)

ঘ. ক্রোধ: অত মাথা গরম করলি কি কাজ অয়?
(অত মাথা গরম করলে কি কাজ হয়?)

ঙ. চুল: তুই এ্যাকদিনও মাতা আচরাইস নে?
(তুই একদিনও মাথা আচড়াস না?)

চ. পরিশ্রম: মাতার গাম পায়ে ফেইলে টাকা কামাই করতি অয়।
(মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করতে হয়)

ছ. প্রত্যঙ্গ: তার মাতায় চুল কোম।
(তার মাথায় চুল কম)

জ. প্রধান: সে এই গিরামের মাতা।
(সে এই গ্রামের মাথা)

ঝ. বুদ্ধি: ছোটো অলি কি অবে ছিমরাডার মাতা ভালো।
(ছোটো হলে কি হবে ছেলেটার মাথা ভালো)

ঞ. শীর্ষে: গাছের মাতায় এট্টা পাহি বোইসে রোইছে।
(গাছের মাতায় একটা পাখি বসে রয়েছে)

ট. সর্বনাশ: পুলাডার মাতা খাইশ নে।
(ছেলেটার মাথা খাস না)

ঠ. হতাশ: কতাডা শুইনে ত্যার মাতায় আয়াস ভাইঙ্গে পড়ছে।
(কথাটা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে)

এবারে কয়েকটি ভিন্নার্থক রূপমূলের শুধু বিবরণ দেওয়া হলো:

(১৭) পাহা (পাকা)
অভিজ্ঞ, ইটের তৈরি, খাঁটি, চূড়ান্ত, নিপুণ, পক্ক, বখাটে, সাদা, স্থায়ী।

(১৮) কথা
অনুরোধ, উপদেশ, ওয়াদা, গল্প, বাক্য, বিস্ময়।

৪.৩.২ অভিন্ন রূপমূলের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ

একই রূপমূল কখনও একাধিক চেতনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যথা—

(১৯) ক. একই অনুভূতির একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি: প্রয়োগের পরিবর্তন।
শুন্দোর মাইয়ে (সুন্দরী মেয়ে)
শুন্দোর জামা (সুন্দর জামা)
বালো (ভালো) বাড়ী, বালো (ভালো) বোউ

খ. একটা রূপমূলে একাধিক অনুভূতি: বিভিন্ন অর্থ
উত্তার (উত্তর) দিক, পোরোছনের (প্রশ্নের) উত্তর, উত্তার (উত্তর) পুরুষ

গ. একাধিক রূপমূল: সমার্থক। যেমন:
মানুষের মোন (মানুষের মন), চোল্লিশ শ্যারে অ্যাক মোন (৪০ সেরে এক মণ)

৪.৩.৩ প্রয়োগের পরিবর্তন

একই রূপমূল প্রয়োগের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অনুভূতি বা চেতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে একদিকে দ্বৈততা ও অন্যদিকে অস্পষ্টতা ও অনুভূতির স্থিতিস্থাপকতা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (মোরশেদ, ১৯৯৭)। এখানে কখনও ঐ বস্তু বা বিষয় সরাসরি বিশেষণযুক্ত অর্থ প্রকাশ করছে। কখনও বা বিশেষণ এবং বিশেষ্য উভয় অংশ মিশে তৈরি এমন একটি অর্থ যা নিছক ঐ বস্তু বা বিষয়টিকে বোঝাচ্ছে না। যেমন—'লোহার শরিল' দেহকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু 'দয়ার শরিল' বলতে বোঝাচ্ছে মানবিকতাকে, শরীরকে নয়।

২০) ক. শরিল (শরীর)
লুয়ার শরিল (লোহার শরীর)
মানুষির শরিল (মানুষের শরীর)

দয়ার শরিল (দয়ার শরীর)
নরোম শরিল (নরম শরীর)
শুন্দোর শরিল (সুন্দর শরীর)
খ. ঘর
ইটির (ইটের) ঘর
মাডির ঘর (মাটির ঘর)
খরের ঘর (খড়ের ঘর)
খারাপ ঘর
শুন্দোর ঘর
টিনির ঘর
গ. নাম
মানুষির নাম (মানুষের নাম)
বদনাম (অখ্যাতি)
শুন্দোর নাম
ডাক নাম
নাম ডাক (খ্যাতি)
ঘ. ঘাট
পুখুরির ঘাট (পুকুরের ঘাট)
গাংগের ঘাট (নদীর ঘাট)
খিয়া ঘাট (খেয়া ঘাট)
শানবান্দা ঘাট (সানবাঁধা ঘাট)

খ. একটা রূপমূলের একাধিক অর্থ

একটা রূপমূলের একাধিক অর্থ বিচারে রূপমূলের অর্থগত দিক ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে একটা রূপমূলের পূর্বতন অর্থ সংরক্ষিত থাকতে এবং তার সঙ্গে এক বা একাধিক নতুন অর্থ প্রকাশিত হয়। যথা—একটা রূপমূলের একাধিক অর্থ বিচারে রূপমূলের অর্থগত দিক ব্যাখ্যা করা হয়। প্রয়োগের পরিবর্তনই বহুবিধ অর্থের প্রধান উৎস (মোরশেদ, ১৯৯৭)।

(২১) খুদার আত (খোদার হাত) ক্ষমতা অর্থে
মানুষির আত (মানুষের হাত)

(গ) সমধ্বন্যাত্মক রূপমূল:

একই রূপমূলের যখন একাধিক অর্থ হয়, তখন তা সমধ্বন্যাত্মক রূপমূল হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব রূপমূলের অর্থ নির্ণয়ে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। সমধ্বনির ক্ষেত্রে দুটো সহজাত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিবেচ্য। তা হলো—রূপমূলগুলো যার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলো বাক্যতত্ত্বগত দিক থেকে সমশ্রেণির এবং রূপমূলগুলো সাধিতভাবে সমশ্রেণির (মোরশেদ, ১৯৯৭)। যথা—মাতা (মাথা) রূপমূল বিশেষ্য এবং সাধিত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্যান্য মাতা রূপমূলের সমগোত্রীয়।

উদাহরণ—

(২২) (ক) গাছের মাতায় বৈইসে আছে। (গাছের মাথায় বসে আছে)
(খ) সে এ গিরামের মাতা। (সে এ গ্রামের মাথা)
(গ) তার মাতায় টাক পরছে। (তার মাথায় টাক পড়েছে)
(ঘ) তার মাতা ভালো। (তার মাথা ভালো)

সমধ্বন্যাত্মক রূপমূলের ক্ষেত্রে এই শ্রেণির শর্ত রূপমূল তুল্য বস্তুরূপে পরিচিত। এছাড়া বাহ্যিক সীমানার দিক থেকেও সমধ্বন্যাত্মকতা বিচার করা যেতে পারে। দুটো রূপমূল ধ্বনিগত দিক থেকে বাহ্যিকভাবে সমশ্রেণির হতে পারে যদি তাদের মধ্যে সমশ্রেণির ধ্বনিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। রূপমূল দুটোর মধ্যে অভিন্ন বানানের প্রতিরূপ থাকলে সেগুলো প্রচলিতভাবে সমশ্রেণির বলে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। দুটো রূপমূলের মধ্যে সমধ্বন্যাত্মক দিক নির্দেশে তিনটি শর্ত একান্ত প্রয়োজনীয় (মোরশেদ, ১৯৯৭)। এগুলো হলো—

(২৩) ক. রূপমূলগত বৈশিষ্ট্য
খ. বাক্যতত্ত্বীয় দিক সমভাবে বিনিমেয়
গ. বাহ্যিক অভিন্নতা।

চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় ফরিদপুরের উপভাষায়ও সমধ্বন্যাত্মক রূপমূল ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ—

১। অন্তোর (বি)- হৃদয়
অন্তোর (অব্য)- থেকে, ধরে

২। অয়-(ক্রি)- হয়
অয়-(সব)- সে

৩। আসতিছি (ক্রি)- আসি
আসতিছি (ক্রি)- হাক, ডাক

৪। আইটে-(বি)- বীচি
আইটে-(ক্রি)- হাটিয়া> হেঁটে

৫। আইল্লে (বি)- কাজের লোক
আইল্লে (বিন)- লবনহীন

৬। আসুক-(ক্রি) - আসুক
আসুক-(বি)- ইক্ষু

৭। আউ স (বি)- ধান বিশেষ
আউস (বি)- সখ

৮। আগোল-(ক্রি)- বাধা দেওয়া
আগোল-(বি)- অর্গল, দরজার খিল

৯। হাড় (বি)- হাট
হাড় (বি)- হাটা অর্থে

১০। আডি-(বি)- বীজ
আডি-(বি)- আটি, গুচ্ছ
আডি-(ক্রি)- হাটি

১১। আত্তা-(বি)- আত্মা
আত্তা-(বিন)- পোষ্য

১২। আদার-(বি)- বড়শির টোপ
আদার-(বিন)- অপরিচ্ছন্ন

১৩। আমরা-(সর্ব) আমি, তুমি, সে
আমরা-(বি)- ফল বিশেষ

১৪। আরি-(বি)- প্রতিজ্ঞা
আরি-(বি)- হাড়ি

১৫। আল-(বি)- আইল, জমির
আল-(ক্রি)- হালচাষ
আল-(বি)- বিছার কাটা

১৬। আশ-(বি)- হাঁস
আশ-(ক্রি)- হাসি

১৭। আশা-(বি)- পুরুষ হাঁস
আশা-(বি)- জন্য, সম্ভাবনা
আশা-(ক্রি)- হাসা

১৮। আশি-(ক্রি)- আসি
আশি-(ক্রি)- হাসি
আশি-(বি)- স্ত্রী হাঁস
আশি-(বি)- সংখ্যা বিশেষ

১৯। উদ্ধার-(বিন)- ধার নেওয়া
উদ্ধার-(ক্রি)- মুক্তি

২০। ওডা-(সর্ব)- ওটা
ওডা-(ক্রি)- উঠা

২১। ওমা-(সর্ব)- মাকে সম্বোধন
ওমা-(বিন)- আশ্চর্যবোধক

২২। কশা-(বি)- কৃপণ
কশা-(বি)- কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ বিশেষ
কশা– (বি)- শক্তে করে বাঁধা

২৩। কাইত-(বি)- পার্শ্ব
কাইত-(ক্রি)- শোয়া

২৪। কাইল্লে-(বিন)- কালো
কাইল্লে-(বি)- কালের

২৫। কেউটটা-(বি)- পাটের খড়
কেউটটা-(বি)- কচ্ছপ

২৬। কাচা-(সর্ব)- পরিষ্কার করা
কাচা-(বিন)- কাঁচা

২৭। কাটি-(ক্রি)- কাটাকাটি
কাটি-(বি)-কাঠি

২৮। কাডে-(ক্রি)- কাটে
কাডে-(বি)- কাঠে

২৯। কানি-(বি)- জমির মাপ
কানি-(বি)- অন্ধ অর্থে

৩০। কায়দা-(বি)- বৃদ্ধি, কৌশল
কায়দা-(বি)- ছেপারা, আমপারা

৩১। কালা-(বি)- কালো রং
কালা-(বি)- ময়লা, অপরিচ্ছন্ন

৩২। কাহোই-(বি)- কাকরোল, তরকারি বিশেষ
কাহোই-(বি)- চিরুনি

৩৩। কুইটটে-(ক্রি)- কেটে
কুইটটে-(ক্রি)- ধানভানা

৩৪। কোই-(সর্ব)- কোথায়
কোই-(বি)- কই মাছ

৩৫। কোইর‍্যে-(ক্রিয়া)- করিয়া>করে
কোইর‍্যে-(বি)- করিমজান, ডাক নাম বিশেষ

৩৬। কুল-(বি)- কিনারা
কুল-(বি)- বংশ
কুল-(ক্রি)- দিশা পাওয়া
কুল- (বি)- বরই (ফল)

৩৭। ক্ষুর-(বি)- পশুর পায়ের ক্ষুরা
ক্ষুর-(বি)- চুল কাটার অস্ত্র বিশেষ

৩৮। খাইট্টে-(ক্রি)- খাটিয়া>খেটে, পরিশ্রম করে
খাইট্টে-(বি)- মুগুর
খাইট্টে-(বি)- খাটো

৩৯। খামার-(বি)- তিরস্কার, বকা
খামার-(বি)- জায়গা, জমি

৪০। খুইত্তা-(বিন)- ত্রুটি
খুইত্তা-(বি)- থলে

৪১। খেতি-(বি)- ক্ষতি
খেতি-(বিন)- খ্যাতি

৪২। খোইয়া-(বি)- এক প্রকার ধান বিশেষ
খোইয়া-(ক্রি)- খসে পড়া

৪৩। খোলা-(বি)- উন্মুক্ত খোলা-(বি)- খই ভাজার পাতিল

৪৪। গযাল-(বি)- মাছ বিশেষ গযাল-(বি)- মুর্খ, বোকা
গযাল-(বি)- পেরেক, লোহা

৪৫। গাই-(বি)-গাভী
গাই-(ক্রি)- গান গাই

৪৬। গাইর‍্যে-(বি)- খাদা, গর্ত গাইর‍্যে-(ক্রি)- পুতে রাখা

৪৭। গাও-(বি)- শরীর
গাও-(বি)- গ্রাম
গাও-(ক্রি)- গান গাও

৪৮। গারুইললা -(বি)- সাপুড়ে
গারুইললা-(বি)- পেটুক

৪৯। গুন-(বি)- রশি, যা দিয়ে নৌকা টানে
গুন-(বিন)- গুণাবলী
গুন-(বি)- যোগ্যতা

৫০। গুনা-(বি)- গোনাহ, পাপ
গুনা-(বি)- লোহার তার রাশি
গুনা-(বি)- গনোনা

৫১। গোডা-(বি)- খুজলি, পাচড়া
গোডা-(বিন)- সমস্যা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি

৫২। চাই-(বি)- মাছ ধার খাচা চাই-(ক্রি)- চাওয়া
চাই-(ক্রি)- দেখা

৫৩। চান-(বি)- চাঁদ
চান-(বি)- বরকত

৫৪। চিনা-(বি)- পরিচিত
চিনা-(বি)- একজাতীয় জোঁক, জঙ্গলে বাস করে

৫৫। চুংগি-(বি)- খেজুর গাছের রস বের করার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের কঞ্চি
চুংগি-(বি)- নাকের নোলক

৫৬। ছারা-(ক্রি)- ছেড়ে দেওয়া
ছারা-(বি)- ব্যতীত, ছাড়া

৫৭। ছিরি-(বি)- শ্রী
ছিরি-(বিন)- যোগ্যতা

৫৮। ছোডা-(বি)- রাশি
ছোডা-(বি)- সোটা, কাপড় পরিষ্কারের পাউডার
ছোডা-(ক্রি)- ছুটে যাওয়া

৫৯। ছোরা-(বি)- কিশোর
ছোরা-(ক্রি)- ছুঁড়ে মারা
ছোরা-(বি)- চাকু

৬০। জাইল্লা-(বি)- থলে
জাইল্লা-(বি)- জেলে

৬১। জাগা-(বি)- জায়গা, জমি
জাগা-(ক্রি)- জাগরণ

৬২। জান-(বি)- জল নিষ্কাশনের জায়গা
জান-(বি)- জীবন

৬৩। জাল-(বি)- মিথ্যা, জালিয়াতি, নকল
জাল-(বি)- মাছ ধরার ফাঁদ

৬৪। জালি-(বি)- কচি
জালি-(বি)- থলে

৬৫ । জের-(বি)- টিনের পাত্র
জের-(বি)- রেশ

৬৬ । জোরা-(ক্রি)- যুক্ত হওয়া
জোরা-(বি)- দুটো, একজোড়া

৬৭ । ঝরা-(ক্রি)- ঝরে যাওয়া
ঝরা-(বি)- দ্বিতীয় দিনের খেজুর রস

৬৮ । ঝারা-(ক্রি)- জোরে নাড়া
ঝারা-(ক্রি)- ঝেড়ে ফেলা
ঝারা-(ক্রি)- মন্ত্র পড়ে ফু দেওয়া

৬৯ । ঝাহা-(ক্রি)- নাড়া দেওয়া
ঝাহা-(বি)- বাঁশের চাঙ্গাড়ী

৭০ । ঝোলা-(বি)- থালা
ঝোলা-(ক্রি)- ঝুলে থাকা

৭১ । ঠোশ পরা-(বি)- অগ্নিদগ্ধ হলে শরীরে গুটে বাঁধা
ঠোশ পরা-(ক্রি)- রাগান্বিত হয়ে মুখ ভার করে থাকা

৭২ । ডালা-(বি)- পাত্র, ছোট সাজি
ডালা-(বি)- ভাটা লাগা
ডালা-(বি)- গাছের শাখা, ডাল

৭৩ । ঢিলা-(বি)- আলগা
ঢিলা-(বি)- মাটির শুকনো টুকরা

৭৪ । ঢোক-(ক্রি)- ঢোক গেলা
ঢোক-(ক্রি)- ঢুকে যাওয়া, তুই ঢোক

৭৫ । তিল-(বি)- গায়ের কালো চিহ্ন
তিল-(বি)- শস্য বিশেষ

৭৬ । ত্যানা-(বি)- ছেঁড়া কাপড়
ত্যানা-(বিন)- দুর্বল

৭৭ । দল-(বি)- পার্টি
দল-(বি)- ঘাস, মহিষের খাদ্য

৭৮ । দাবানো-(ক্রি)- দাবিয়ে রাখা
দাবানো-(বি)- ভয় দেখানো

৭৯ । ধার-(বি)- ঋণ করা
ধার-(বি)- ধারাল

৮০ । ধোয়া-(ক্রি)- ধৌত করা
ধোয়া-(বিন)- ধুয়া, ধূমযুক্ত

৮১ । নাই-(বি)- নাভি
নাই-(বি)- নেই

৮২ । নায়-(বি)- নৌকায়
নায়-(ক্রি)- গোসল করে

৮৩ । নারা-(বি)- খড় বিশেষ
নারা-(ক্রি)- নেড়ে দেওয়া

৮৪ । ন্যায়-(ক্রি)- নিয়ে যায়
ন্যায়-(বি)- ন্যায় বিচার

৮৫ । পাইক্কা-(অব্য)- জন্য
পাইক্কা-(ক্রি)- পেকে যাওয়া

৮৬ । পাক্কা-(ক্রি)- ছুঁড়ে মারা
পাক্কা-(বি)- খাটি, পরিপক্ক

৮৭ । পাচ-(বি)- পাঁচ
পাচ-(বি)- পিছন

৮৮ । পাড়া-(ক্রি)- পাঠানো
পাড়া-(বি)- পাঠা ছাগল
পাড়া-(বি)- পাথরের খণ্ড, যা দ্বারা মরিচ মসলা পিশে

৮৯ । পার-(বি)- নদীর তীর
পার-(ক্রি)- পার হওয়া

৯০ । পালা-(ক্রি)- পালন করা
পালা-(ক্রি)- পলায়ন করা, তুই পালা

৯১ । পোক্খি-(বি)- পাখি
পোক্খি-(সর্ব)- চাচাকে সম্বোধন

৯২ । পোয়া-(বি)- ছেলে
পোয়া-(বি)- ১ সেরের ১/৪ অংশ

৯৩ । ফাজিল-(বি)- চালাক
ফাজিল-(বি)- এফ.এম.পাশ
ফাজিল-(বি)- দুষ্ট

৯৪ । ফাল-(বি)- লাঙ্গলের ফলা
ফাল-(ক্রি)- লাফ দেওয়া

৯৫ । ফুল-(বি)- ফুল বিশেষ
ফুল-(বি)- মেয়েলোকের ঋতুস্রাব
ফুল-(ক্রি)- পরিপূর্ণ

৯৬ । ফ্যাতরা-(বি)- কলাগাছের ডালা
ফ্যাতরা-(বি)- ছদকা

৯৭ । ফ্যার-(বি)- বিপদ
ফ্যার-(বি)- দাড়ি পাল্লার উঁচু নিচু

৯৮ । বর-(বি)- পাত্র
বর-(বি)- পানের বরজ

৯৯ । বররা-(বি)- বাঁশের শলা
বররা-(বি)- এক প্রকার বাঁশ

১০০ । বরাত-(বি)- অন্যকে ভারাপর্ণ
বরাত-(বি)- কপাল, ভাগ্য

১০১ । বরো-(বিন)- বড়
বরো-(বিন)- খুব

১০২ । বাইট্টে-(বি)- খাটো
বাইট্টে-(ক্রি)- পিশিয়া>পেশে
বাইট্টে-(বি)- কোমরের ফিতা

১০৩ । বাইন্না-(বি)-অলংকার তৈরির কারিগর, বেনে।
বাইন্না-(বি)- এক প্রকার মরিচ
বাইন্না-(বি)- ব্যবসায়ী

১০৪ । বাইয়া-(ক্রি)- বাহিয়া>বেয়ে
বাইয়া-(ক্রি)- বাহিয়া, নৌকা বেয়ে

১০৫ । বান-(বি)- তীর
বান-(বি)- বন্যা, প্লাবন
বান-(বি)-বাঁধ
বান-(বি)- বেঁধে রাখ

১০৬ । বারি-(বি)- গৃহ, বসবাসের স্থান, কয়েকটি ঘর নিয়ে একটি বাড়ি।
বারি-(ক্রি)- আঘাত দেওয়া
বারি-(বি)- বরষা

১০৭ । বাশ-(বি)- বাঁশ
বাশ-(ক্রি)- বাস করা
বাশ-(বি)- ঘ্রাণ

১০৮ । বোই-(বি)- বই
বোই-(বি)- কচুর লতি
বোই-(ক্রি)- বসি

১০৯ । বোইডা-(বি)- বইটা
বোইডা-(বি)- বইঠা

১১০ । ব্যার-(বি)- কুয়া
ব্যার-(বি)- ঘিরে রাখা

১১১ । ভার-(বি)- পানির পাত্র
ভার-(বি)- ওজন

১১২ । মাজা-(ক্রি)- পরিষ্কার করা
মাজা-(বি)- কোমর

১১৩ । মাতা-(ক্রি)- মত্ত হওয়া
মাতা-(বি)- থামা মাতা-(বি)- মা
মাতা-(বি)- মাথা

১১৪ । মাপ-(বি)- ক্ষমা
মাপ-(বি)- ওজন

১১৫ । মোচ-(বি)- গোঁফ
মোচ-(ক্রি)- পরিষ্কার কর্

১১৬ । মোছা-(ক্রি)- পরিষ্কার করা
মোচা-(বি)- প্যাকেট, দ্রব্য
মোচা-(বি)- কলার ফুল

১১৭। মুতা-(ক্রি)- প্রশ্রাব করা
মুতা-(বি)- ডাব নারকেলের ছোবড়া

১১৮। মোনতোর-(বি)- মন্ত্র, বোকা
মোনতোর-(অব্য)- মাত্র, প্রাথমিক অবস্থায়

১১৯। ম্যালা-(বি)- মেলা
ম্যালা-(অব্য)- অনেক

ফরিদপুরের উপভাষায় উল্লিখিত সমধ্বন্যাত্মক রূপমূলসমূহ ব্যবহৃত হয়। তবে বাক্যে ব্যবহারের সময় স্বরভঙ্গির (Intonation) তারতম্য ঘটে থাকে। সমধ্বন্যাত্মক রূপমূলসমূহ যেভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, সেরকম উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

(২৪) ক.	গাই	–	বশিরগে তিনডে গাই আছে। (বশিরদের তিনটা গাভী আছে)
	গাই	–	সে গান গাতি পারে না। (সে গান গাইতে জানে না)
খ.	গাও	–	তার গায়ে শক্তি নেই। (তার গায়ে শক্তি নেই)
	গাও	–	এ গিরামের মানুষ ভালো না। (এ গ্রামের মানুষ ভালো না)
গ.	জোরা	–	তার অ্যাক জোরা বলদ আছে। (তার এক জোড়া বলদ আছে)
	জোরা	–	খুব সয়ালে হাল জুরবি। (খুব সকালে হাল জুড়বি)
ঘ.	উদ্ধার	–	তারে কেও ধার দেবে না। (তারে কেউ ধার দিবে না)
	উদ্ধার	–	সে এই বিপদ থন উদ্ধার হইতে পারবে না। (সে এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারবে না)
ঙ.	পার	–	কিরে? নদীর পারে বোইসে কি করিস? (কিহে? নদীর পাড়ে বসে কি কর?)
	পার	–	পয়সা না দিলি পার করব না। (পয়সা না দিলে পার করব না)
চ.	বর	–	হাশেমের ম্যালা পানের বর আছে। (হাশেমের অনেক পানের বর আছে)
	বর	–	কাজ থুইয়ে বর সাইজ্জ্যে বইসে রোইছো। (কাজ রেখে বর সেজে বসে রয়েছ)

৪.৪ বিপরীতার্থক রূপমূল

বিপরীতার্থক রূপমূল সমার্থক রূপমূলের বিপরীতধর্মী অর্থ নির্দেশ করে। বিপরীতার্থক রূপমূলে

একটা রূপমূলের সঙ্গে অন্য একটা রূপমূলের অর্থগত বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে। যখন কোনো একটা রূপমূল ব্যবহৃত হয়, তখন তা বক্তা ও শ্রোতার কাছে তার একটা বিপরীত গঠন উপস্থাপিত হয়ে তাকে। রূপমূলের অর্থগত এই বৈপরীত্যই বিপরীতার্থক দিক হিসেবে চিহ্নিত (মোরশেদ, ১৯৯৭)। যেমন: মাইয়ে-ছাওয়াল, উপরে-নিচে, শুমান-অশুমান, হোংকে-পেছনে। এই রূপমূলগত বৈপরীত্য বিভিন্ন শ্রেণির হতে পারে। যেমন—

(ক) ক্রম মাত্রা
(খ) অক্রম মাত্রা

(ক) ক্রম মাত্রার ক্ষেত্রে তুলনার মান লক্ষ করা যায়। দুটি রূপমূলের চেয়ে উভয়ের মধ্যে একই বস্তু রয়েছে কিনা তা এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

(খ) অক্রম মাত্রা তুলনার মান বস্তুগত উপলব্ধির দিক বিচার্য।

যথা—'ক' হলো মানুষ, এর অর্থ 'ক' অমানুষ নয়। আবার যদি বলা হয় 'ক' মানুষ নয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'ক' হচ্ছে অমানুষ। অনেক সময় রূপমূলতগত সম্পর্কহীন গঠনের সাহায্য বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। যথা—আগা-মাথা।

এক্ষেত্রে বিপরীত অর্থসূচক রূপমূল দুটোর মূলধ্বনিও পৃথক। আবার বিপরীত অর্থসূচক অনেক রূপমূলের গঠনগত সাদৃশ্যও বিদ্যমান। জানা-অজানা।

(২৫) এখন রূপমূলগত সম্পর্কহীন গঠনের সাহায্যে বিপরীতার্থক রূপমূলের তালিকা দেওয়া হলো:

মূল রূপমূল	বিপরীতার্থক রূপমূল
আউলো-ঝাউলো (এলোমেলো)	গুছাইনা (গোছানো)
আও (আস)	যাও
আওয়া (আসা)	যাওয়া
আগে	পিছে (পিছনে)
আন্দার (অন্ধকার)	ফরসা (আলোকিত)
আসোল	নয়োল (নকল)
উচো (উচ্চ)	নিচে (নিচু)
উত্তোর (উত্তর)	দোকখিন (দক্ষিণ)
এইডে (এটা)	ঐডে (ওটা)
এইহেনে (এখানে)	সেইহেনে (সেখানে)
ওডা (উঠা)	নামা
কাছে	দূরে
কান্দা (কাঁদা)	আসা (হাসা)
কালা (কালো)	ধলা (সাদা)
কিনা	ব্যাচা (বিক্রয়)
খোলা	বন্দো (বন্ধ)
গোপন	ফাস (ফাঁস)

চোর	সাধু
ছুড়া (ছোট)	বড়ো
ছ্যারা (ছোট)	বুড়ো (বুড়া)
জাগা	ঘুমাইনো (ঘুমান)
তলা (পায়ের গোড়া)	মাথা
থামা	চলা
দেনা	পাওনা
দিয়া (দেওয়া)	নিয়া (নেওয়া)
নোতুন	পুরান
নরোম	শক্ত
নেয়া	থুয়া (রাখা)
লাব (লাভ)	লুশকান (লোকসান)

(২৬) গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে এমন রূপমূলের মাধ্যমে অর্থগত বৈপরীত্য সৃষ্টি:

মূল রূপমূল	বিপরীতার্থক রূপমূল
অতিবিশটি	অনাবিশটি
অভ্যাশ	অনভ্যাশ
আকার	নিরাকার
আস্তিক	নাস্তিক
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইহকাল	পরকাল
কাম (কাজ)	আকাম (অকাজ)
খাওয়া	আখাওয়া (না খাওয়া)
খুত	নিখুঁত
চল	অচল
জ্ঞান	অজ্ঞান

৪.৫ বিশিষ্টার্থে রূপমূলের প্রয়োগ (বাগধারা)

চলিত শিষ্ট বাংলায়, এমনকি অন্যান্য ভাষাতেও এমন কতকগুলো রূপমূলসমষ্টি পাওয়া যায় যেগুলো আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে বিশিষ্ট অর্থে সেসব রূপমূলের অর্থ পরিস্ফূট হয়। চলিত শিষ্ট বাংলায় একে বলে বাগধারা। অর্থতত্ত্বে বাগধারা বা বিশিষ্টার্থে বাক্যাংশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এক্ষেত্রে রূপমূল বা রূপমূলসমষ্টি সেগুলোর মূল অর্থের মাধ্যম নয় বরং অন্য একটি বিশেষ অর্থে প্রকাশিত হয়। চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় ফরিদপুরের উপভাষাতেও বিশিষ্টার্থে রূপমূলের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অবশ্য যেসব রূপমূলসমষ্টি চলিত শিষ্ট বাংলায় প্রচলিত, সেগুলোর অনেকগুলো ফরিদপুরের উপভাষায়

ব্যবহৃত হয়, তবে তা উপভাষার নিজস্ব উচ্চারণে। আবার কিছু কিছু চলিত শিষ্ট বাংলার উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। যথা—

(২৭)

১। আঙ্গুল ফুইলে ক্যালাগাচ (আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ)—হঠাৎ বড়লোক হওয়া
আলম পরের ট্যায়া মাইরে অ্যাহোন আঙ্গুল ফুইলে ক্যালাগাচ (আলম অন্যের টাকা মেরে এখন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ)।

২। হাডে আড়ি ভাঙা (হাটে হাঁড়ি ভাঙা)—গোপন কথা প্রকাশ করা
আবার কথা কলি হাডে আড়ি ভাইংগে দিমু (আবার কথা বললে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেব)।

৩। আতে ঘা লাগা—প্রাণে আঘাত
অ্যাতোদিন হোনো নাই অ্যাহোন আতে ঘা লাগে ক্যা? (এতদিন শোনোনি এখন আতে ঘা লাগে কেন?)

৪। আলালের গরের দুলাল—আদরের সঙ্গে মানুষ
এরেদ্দে কাম অবে না, এ 'অইলো আলালের গরের দুলাল (একে দিয়ে কাজ হবে না, এ হল আলালের ঘরে দুলাল)।

৫। আয়াশ ভাইংগে পরা (আকাশ ভেঙ্গে পড়া)—হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হওয়া
বন্ধুর মরার খবর সুইনে যেন মাথায় আয়াশ ভাইংগে পরলো (বন্ধু মরার খবর শুনে তার যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল)।

৬। আয়াশের থনে পরা (আকাশ থেকে পড়া)—বিস্মিত হওয়া
ধলু চুরি অরতে যাইয়ে দরা পরছে এ কথা হুইন্নে আমি য্যান আহাশ থনে পরছি (ধলু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে একথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়েছি)।

৭। ইচরে পায়া (ইচড়ে পাকা)—অকাল পক্ক
এই ইচরে পায়া পোয়া দিয়ে কোনো কাম অবে না (এই ইঁচড়ে পাকা ছেলে দিয়ে কোন কাজ হবে না)।

৮। উইরে আইসে জুইরে বয়া (উড়ে এসে জুড়ে বসা)—অকস্মাৎ আবির্ভাব
হে এই গিরামে উইরে আইয়া জুইর্‌রা বোইছে (সে এই গ্রামে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে)।

৯। অ্যাক চোয়া (এক চোখা)—পক্ষপাতিত্ব
হে অ্যাক চোয়া মানস, হ্যার কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া যাইবে না (সে এক চোখা মানুষ, তার কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না)।

১০। ওশুদে দরা (ঔষধে ধরা)—যথাযোগ্য প্রভাব পড়া
ফরিদ এ্যামোন ওশুদ দেছে অ্যাহোন তারে ছারা কিছুই বোঝে না (ফরিদ এমন ওষুধ দিয়েছে এখন তারে ছাড়া কিছুই বুঝে না)।

১১। কান কাডা (কান কাটা)—বেহায়া
অ্যামোন কান কাডা মানুষ আর দেহি নেই, কাইল অ্যত্তো মাইরের পর আইজকে আবার আইছে (এমন কান কাটা মানুষ আর দেখিনি, কাল এত মারের পর আজ আবার এসেছে)

১২। কপাল ফিরা—ভাগ্য ভালো হওয়া।
হোচেন অ্যাতোদিন ম্যালা কশটো অরছে এ্যাহোন হ্যার কপাল ফেরছে (হোচেন এতদিন ম্যালা কষ্ট করছে, এখন তার কপাল ফিরেছে? খুলেছে)।

১৩। কানারে হাইকোড দ্যাহানো (অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানো)—বোকা ঠাহর করা
তুমি মোনে অরছো আমি এইডে বুজিনে, কানারে হাইকোড দ্যাহাও (তুমি মনে করেছ আমি এটা বুঝি না, অন্ধকে হাইকোর্ট দেখাও)।

১৪। কিলেইয়ে ভুত ছাড়ানো—যাতে সুমতি আসে এমন মার দেওয়া
হ্যার পরও যদি কতা না সোনে তয় কিলেইয়ে ভুত ছারামু (এতপরও যদি কথা না শোন তবে কিলিয়ে ভূত ছাড়াব)।

১৫। কুলে ওডা (কুলে ওঠা)—বিপদ মুক্ত হওয়া
অ্যাতোদিন পর তুমি কুলে ওটছো (এতদিন পর তুমি কুলে উঠেছ)।

১৬। খাল কাইটে কুমির আনা (খাল কেটে কুমির আনা)—শত্রু ডেকে আনা।
কালুরে ডাইকে আইনে খাল কাইটে ঘরে কুমির আনছো এ্যাহোন বোঝো। (কালুকে ডেকে এনে খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছ এখন বুঝ)।

১৭। খোলা ঢুলানো—অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করা
তুমি আর খোলা ঢুলোইওনা।

১৮। গাছে তুইলে ফালাইয়ে দেওয়া (গাছে তুলে ফেলে দেওয়া)—প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহায্য না করা।
ভোট দেওয়ার কথা কইয়ে ভোডে খারা ওইরে অ্যাহোন ধলুর পাত্তা নাই। অ্যাকেই বলে গাছে তুইলে ফালাইয়ে দিয়া। (ভোট দেওয়ার কথা বলে ভোটে দাঁড় করিয়ে এখন ধলুর পাত্তা নেই। একেই বলে গাছে তুলে ফেলে দেওয়া)

১৯। গাঠ্‌ঠি গোল অরা (গাঠুরি গোল করা)—তল্পিতল্পাসহ চলে যাওয়া
ভাত খাইয়ে যদি নিমকআরামি অরো তলিপারে গাঠ্‌ঠি গোল অরা লাগবে (ভাত খেয়ে যদি নেমকহারামি কর তবে গাঠুরি গোল করতে হবে)।

২০। গায় কাডা দেওয়া (গায়ে কাটা দেওয়া)—অত্যন্ত ভয় পাওয়া
দুফুর রাতি বড গাছের তলাদ্দিয়ে যাওয়ার সময় মিজানের গায়ে কাডাদ্দিয়ে ওডছে।
(দুপুর রাতে বট গাছের নিচে দিয়ে যাওয়ার সময় মিজানের গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে)।

২১। গাব দিয়া—বসে থাকা
তুমি যহোন আমার ভাইরে মারবা তহোন আমি গাব দিমু (তুমি যখন আমার ভাইকে মারবে তখন আমি গাব দিব?)

২২। গায়ে আত তুলা (গায়ে হাত তোলা)—প্রহার করা
মাইয়েডা পিরাই অর হত মার গায়ে আত তোলে (মেয়েটা প্রায়ই তার সৎ মায়ের গায়ে হাত তোলে)।

২৩। গায়ে তেল অওয়া (গায়ে তেল হওয়া)—গায়ে জোর হওয়া
গায়ে ত্যাল অওয়ায় হে হ্যার বায়ের মুহের উপরে কথা কয় (গায়ে তেল হওয়ায় সে তার বাপের মুখের ওপর কথা বলে।

২৪। গায় বাতাস লাগা (গায়ে বাতাস লাগা)—গুরুত্ব দেওয়া
অ্যাতোদিন গায়ে বাতাস লাগে নেই, অ্যাহোন বোজো (এতদিন গায়ে বাতাস লাগেনি এখন বুঝ)।

২৫। গায়ের ঝাল ঝারা—প্রতিশোধ নেওয়া
আইজ তারে পথে পাইয়ে গায়ের জাল জাইররে দিছি (আজ তাকে পথে পেয়ে গায়ের ঝাল ঝেড়ে দিয়েছি)।

২৬। গায়ে লাগা—গুরুত্ব দেওয়া
যহোন নিজে কামাই অরবা তহোন গায়ে লাগবে (যখন নিজে আয় করবে তখন গায়ে লাগবে)।

২৭। গাল ফুলোনো—রাগ করা
খালি খাতি পারো গাল ফুলাইয়ে লাব নাই (খেলে খেতে পার গাল ফুলিয়ে লাভ নেই)।

২৮। গুললি মারা—বাদ দেওয়া)
অর কথা কোইয়ো না, অর কথায় গুললি মারি (ওর কথা বলো না, ওর কথায় গুললি মারি।

২৯। গবরে পদ্মফুল—নীচ বংশে মহত্ত্বের জন্ম
মাজির পুলা ডিসি অ্যারেই কয় গোবোরে পদ্মফুল (মাঝির ছেলে ডি সি, একেই বলে গোবরে পদ্মফুল)।

৩০। গো মারা—এক গুয়েমি করা
গো মাইররা বইসে থাইক্‌কে লাব কি (গো মেরে বসে থেকে লাভ কি?)

৩১। গুড়ায় গলোত (গোড়ায় গলদ)—মূলে ভুল
এ শমোশ্যায় গুড়ায় গলোত, অতো সয়ালে মেঠবে নানে (এ সমস্যায় গোড়ায় গলদ এত দ্রুত মিটবে না)।

৩২। ঘর পুড়া গরু—বেদনায়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি
কশ্‌টো অরতে অরতে হে আর এই কাম অরতে চায় না, হোন নাই ঘর পোরা গোরু সিদুরে ম্যাগ দ্যাকলে ভয় পায় (কষ্ট করতে করতে সে আর এ কাজ করতে চায় না, শোননি, ঘর পোড়া গরু সিদুরে মেঘ দেখতে ভয় পায়)।

৩৩। ঘুড়ার ঘাশ কাডা (ঘোড়ার গাস কাটা)—অপ্রয়োজনীয় কাজ করা
মোরা কি ঘুড়ার ঘাশ কাটতি আইছি যে কামডা পারমু না (মোরা কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে এসেছি যে কাজটা পারব না)।

৩৪। চোক লাগা—কুদৃষ্টি লাগা
ক্যার জানু চৌক লাগায় হ্যার প্যাডে অশুক অইছে (কার যেন চোখ লাগায় তার পেটে অসুখ হয়েছে)।

৩৫। চোক্‌খু শুল—যাকে সহ্য করা যায় না
ভালো কাম করলিও সত মা তারে দ্যাখতে পারে না, সে যেনো তার চোকখু শুল (ভালো কাজ করলেও সৎ মা তাকে দেখতে পারে না, সে যেন তার চক্ষু শুল)।

৩৬। চাচা আপন পরান বাচা—নিজেকে সামলানো
পুলাডারে নোদির মদ্দি রাইহে কুলে ওডলা, এ অইলো চাচা আপন পরান বাচা অবস্তা (ছেলেটাকে নদীর মধ্যে রেখে কুলে উঠলে, এ হলো চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা)।

৩৭। চোয়ের নিশা—রূপের মোহ
চোয়ের নিশায় মানুষডা আবার বিয়ে করছে (চোখের নেশায় মানুষটা আবার বিয়ে করেছে)।

৩৮। চোয়ের পদ্দা—লজ্জা-শরম
তার চোয়ের পদ্দা থাকলি সে আবার কতা কতি পারে? (তার চোখের পর্দা থাকলে সে আবার কথা বলতে পারে?)

৩৯। জইলে পুইরে মরা (জ্বলে পুড়ে মরা)—হিংসা করা
মাইয়েডার রূপ দেইখে তারা জইলে পুইরে মরে (মেয়েটার রূপ দেখে তারা জ্বলে পুড়ে মরে)।

৪০। জেদের ভাত কুত্তোয় খায়—জিদ রক্ষা করতে গিয়ে সর্বনাশ করা
জেদ ওইরে লাব নাই, জেদের ভাত কুত্তোয় খায় (জেদ করে লাভ নেই জেদের ভাত কুকুরে খায়)।

৪১। ঝিরে মাইরে বৌরে সিয়ান (ঝিকে মেরে বৌকে শেখান)—একজনকে শাস্তি দিয়ে অন্যকে শাসানো
ধলু ইবার ঝিরে মাইরে বৌরে সিয়াইছে (ধলু এবার ঝিকে মেরে বৌকে শিখিয়েছে)।

৪২। টায়ার কুমোইর (টাকার কুমির)—ধনী
সে অ্যাহোন টায়ার কুমোইর ওইছে (সে এখন টাকার কুমির হয়েছে)

৪৩। ঠোঁড (ঠোঁট কাটা)—স্পষ্টভাষী
সে অ্যামোন ঠোঁড কাডা যে য্যা মুহে আয় সেইয়েই কয় (সে এমন ঠোঁট কাটা যে যা মুখে আসে তাই বলে)।

৪৪। ডুব দিয়ে পানি খাওয়া—গোপনে কাজ সিদ্ধ করা
সে ডুব দিয়ে পানি খায় অ্যায়াদশির বয়েও জানে না (সে ডুব দিয়ে পানি খায় একাদশির বাপেরও জানে না)।

৪৫। ত্যালে বেগুনে জইলে ওডা (তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা)—অতি ক্রোধে ভীষণ উত্তেজিত হওয়া।
ঘুষ দিয়ার নাম শুনেই সে এয়েবারে ত্যালে বেগুনে জইলে ওডছে (ঘুষ দেওয়ার নাম শুনে সে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে)।

৪৬। দুই নায়ে পাউ দিয়া (দুই নৌকায় পা দেওয়া)—উভয় দিকে থাকা
দুই নায়ে পাউ দিলে বিপদ অয় (দুই নৌকায় পা দিলে বিপদ হয়)।

৪৭। দুত ক্যালা দিয়ে সাপ পালা (দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা)—শত্রুকে অতি যত্নে লালন-পালন করা।
অ্যাতোদিন দুত ক্যালা দিয়ে সাপ পালছি, অ্যাহোন আমারই ক্ষতি অরতি চায় (এতদিন দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, এখন আমারই ক্ষতি করতে চায়)।

৪৮। দুইমুইখে সাপ (দুমুখো সাপ)—উভয় দলে থাকা
ধলুরে বিশ্বেস কোইররো না, হে দুইমুইখে সাপ (ধলুকে বিশ্বাস কর না সে দুমুখো সাপ)।

৪৯। ধরি মাচ না ছুই পানি—কৌশলে কার্য উদ্ধার
তার চালায়ি বুছছি, সে এ্যাহোন ধরি মাচ না ছুই পানি অবস্থা (তার চালাকি বুঝেছি, সে এখন ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থা)।

৫০। নারি নখ্‌খতরো (নাড়ি নক্ষত্র)—হার হদ্দ
এ কামের নারি নখ্‌খতরো আমার জানা আছে (এ কাজের নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা আছে)।

উৎস নির্দেশ

ইসলাম, পি.এম. সফিকুল। ১৯৯২। *রাজশাহীর উপভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

কাদির, সাযযাদ। ১৯৭৫। *ভাষাতত্ত্ব-পরিচয়*। ঢাকা: বুক সোসাইটি।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ১৯৮৮। *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলকাতা: রূপা এ্যান্ড কোম্পানী।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। ১৯৯৪। বাঙ্গালীর উপভাষা চিন্তা: ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। *বাঙ্গালীর বাংলাভাষা চিন্তা* (মনসুর মুসা সম্পাদিত)। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

———। ১৯৯৭। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ।

শ', রামেশ্বর। ১৪০৩। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপনি।

সেন, সুকুমার। ১৯৯৫। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড।